গোঙ্গু

যুথিকা বড়ুয়া

যাচ্ছিলাম শর্টকাট রাস্তা ধরে ট্রেন ধরবো বলে। যাবার পথেই বিরাট একটা ঝিল পেরিয়ে যেতে হয়। তখন ছিল গ্রীস্মকাল। প্রচন্ড গরম! প্রতিদিন বিকেলে স্থানীয় কিশোর-কিশোরীরা হৈ-হুল্লোড় করতে করতে সাঁতার রেস দিতে নেমে পড়তো ঐ ঝিলে। এককালে 'কলাবতী' নামে এটি একটি প্রসিদ্ধ নদী ছিল! শুনেছি, ঐ নদীতে না কি ভাসমানরত সুবর্ণ পুস্পরেনুর সুসজ্জিত এবং সুদর্শণ কারুকার্যময় বিশাল ময়ূরপঙ্খী নৌকায় তৎকালীন রাজা-বাদশাদের শৌখিন-বিলাসীতার মহরৎ চলতো! চলতো প্রেমলীলা, গোপন অভিসার! চলতো গ্রামোফোন রেকর্ডে অপূর্ব উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের মূর্ছণা। দেবদাসীদের আনা গোনা। আর সেই সঙ্গে চলতো, লাস্যময়ী উর্বশী রমণীদের মনোমুগ্ধকর নৃত্যগীতের আসর। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনের আমলে অবস্থার বিবর্তনে ক্রমান্বয়ে অপব্যবহারে চড় পড়ে ভরে গিয়ে একটি বিরাটাকারের ঝিলে পরিণত হয়! বর্তমানে সেটিই 'কাকঝিল' নামে পরিচিত!

হঠাৎ দূর থেকে দেখি, ঐ ঝিলের চারপাশে লোকে লোকারণ্য। অগণিত মানুষের ভীড়। সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে উপুর হয়ে দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ভাবলাম, সাঁতার রেস হচ্ছে বোধহয়! কিন্তু কেউ কেউ তখনও ছুটে যাচ্ছে দেখতে। আর কেউ সমবেদনা প্রকাশ করে বলছে, -'ইস্, আহারে, বেচারা!'

স্বভাবসুলভ কারণে প্রচন্ড উৎসুক্য নিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকি। কাছাকাছি পৌঁছোতেই লক্ষ্য করলাম, চোখেমুখে কারো আবেগের প্রবণতা নেই। উদ্বেগ নেই। কাউকে উৎসাহীতও মনে হচ্ছেনা। বিমূঢ় ম্লান সবাই, নির্বিকারে তামাশা দেখছে। হঠাৎ ভেসে এলো এক প্রৌঢ়ামহিলার আর্তচিৎকার। তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে বলছেন, -'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমরা কি তামাশাই দেখবে সবাই! একটু মায়াও হচ্ছে না তোমাদের! আশ্চর্য্য, হাঁ করে দেখছ কি! নিঃশ্বাস আঁটকে ছেলেটা মরে যাবে যে! যাও, তোমরা কেউ নেমে শীগ্‌গির টেনে তুলে নিয়ে আসো ওকে!' তখন বুঝলাম, নিশ্চয়ই কেউ পড়ে গিয়েছে ঝিলে! দিলাম উর্দ্ধঃশ্বাসে এক দৌড়! দৌড়ে গিয়ে দেখি, সে এক অবাক কান্ড! রীতিমতো হাস্যকরও বটে! বছর আটেকের একটি নাবালক ছেলে ঘন্টার পর ঘন্টা ডুবে আছে জলে। কখনো তিমি মাছের মতো ভেসে উঠে পলকেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জলের গভীরে। সাংঘাতিক দুঃসাহসী ছেলে সে! কিন্তু তা লোক দেখানোর জন্য নয়! মায়ের অবাধ্যতা এবং বেপরোয়ার কারণেই ওর ঐ নির্মম পরিণতি! দেখলাম, কাঁচাবাঁশের সরু একটি কঞ্চি হাতে নিয়ে ঝিলের পাড়ে দাঁড়িয়ে, মুখের পেশিগুলোকে শক্ত করে ফুলিয়ে, চোখমুখ রাঙ্গিয়ে রাগে গজ্‌গজ্ করছেন তার মাতা অন্নপূর্ণাদেবী। ওনার গুণধর পুত্রুর জল থেকে উঠে এলেই আর রক্ষা নেই, পড়বে পিঠের উপর দমাদম বেতের বারি। কিন্তু কতক্ষণ! অন্নপূর্ণাদেবী অদৃশ্য হয়ে যেতেই ছেলেটি চুপিচুপি জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে এসে ভিজে বিড়ালের মতো থর্‌থর করে কাঁপতে কাঁপতে প্রাণপণে দেয় দৌড়!

ছেলেটির নাম গঙ্গারাম! তো তো স্বরে কথা বলে আর খুব তোতলায়। তাই সবাই ওকে তোতারাম বলে ডাকে! ওরা তিন-ভাইবোন! দুইদিদির একমাত্র ছোটভাই! কত আদরের, ওদের চোখেরমণী! আর মায়ের তো কলিজার টুকরো! আদর করে ওকে গোঙ্গু বলে ডাকতো। কিন্তু যেমন চঞ্চল, অস্থির চিত্তের, তেমনি লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভ, অমনোযোগী! গ্রাহ্যই করতো না মাকে! এক একটা ক্লাস দু'বছর না পড়লে পাশই করতে পারতো না পরিক্ষায়! ওদিকে বেলেল্লাপণাতেও কম পারদর্শী ছিলনা! রাত পোহালেই শুরু হয়ে যেতো ওর নিত্যনৈমিত্তিক তুলকালাম কান্ডের পুনরাবৃত্তি! ওকে যে কোণ্ ধাতূ দিয়ে বিধাতা গড়েছিলেন, ডর-ভয়, লজ্জা-শরমের বিন্দুমাত্র বালাই নেই! পশু-পাখীর চেয়েও অধম! পশু-পক্ষীরাও নিজেদের আরাম বোঝে! শান্তিপূর্ণ নিড়িবিলি জায়গা ওরাও খোঁজে! র্সূয্য অস্তাচলে ঢলে পড়লেই ওরাও যথাসময়ে ফিরে আসে আপন ঠিকানায়। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র গোঙ্গুর বেলায়! নামমাত্র ওর লেখাপড়া! ছুটিরঘন্টা বেজে উঠলেই ব্যস, গোঙ্গু চোখের নিমেষে উধাও! পাত্তাই পাওয়া

যেতোনা! স্কুলের ব্যাগটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে শিকারী হায়নার মতো আম-জামরুলের সন্ধানে চোখদু'টো ওর চড়কির মতো ঘুরতো চারিদিকে। কোনদিন ঘু ঘু ডাকা নির্জন দূপুরে তরতর করে লোকের আমগাছে উঠে পাখীর মতো খুঁটে খুঁটে পাকা আমগুলিই বেছে বেছে খেতো। আর খেয়ে খেয়ে আমের আঁটিগুলি ছুঁড়ে ফেলতো পার্শ্বস্থ ঘর-গৃহস্থের চালের উপর। কখনো পাথর কিংবা ঢিল ছুঁড়ে লোকের টালি ভেঙ্গে দিতো! ওদিকে ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যেতেন অন্নপূর্ণাদেবী! চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠতেন! গোঙ্গু বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত মন্ত্রের মতো শুধু জপতেন, 'এই বুঝি পাড়ার লোকেরা স্বদলবলে নালিশ নিয়ে এলো বোধহয় ওর মায়ের পিন্ডি চটকাতে! মায়ের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করতে! ভগবান, মরণও কেন হয়না আমার!'

ইতিপূর্বে গোঙ্গুর উপদ্রপ, অত্যাচারে পাড়ার বিক্ষিপ্ত মহিলারা কোমড় বেঁধে বিহিত করতে এসে ওর মায়ের সঙ্গেই তুমুল কোন্দল বিবাদ বাকযুদ্ধ শুরু করে দিতো। গালিগালাজ করতো। থানা পুলিশের হুমকি দিতো। আবার কেউ কেউ তীব্র উপহাস করে বলতো, -'বান্দর একখান্ তো পুইষ্যা রাখছ, হ্যাড়ে ছাইর‍্যা দিছ ক্যান বাইরে! মাইনষের যে অনিষ্ট কড়তাছে, খবর রাখো কিছু! থাকো ক্যান্নে নিশ্চিন্তে! বেআক্কল, বেশরম!' আর এইভাবে দিনের পর দিন লোকের কাছে অপদস্থ হতে হতে ক্ষোভে, দুঃখে অপমানে অন্নপূর্ণা একেবারে অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিল! ইচ্ছে হতো, গোঙ্গুর গলাটাই টিপে দিতে। আর দিদিরা তো তিক্ত-বিরক্ত হয়ে নামই নিতোনা কেউ। কাছে এলেই অশৌচীর মতো চোখমুখ বিকৃতি করে ওকে দূর দূর করে তাড়াতো। কিন্তু ওর মায়েরই হয়েছিল যত জ্বালা! না ফেলতে পারতেন না সইতে পারতেন।

অবশেষে একদিন অধৈর্য্য হয়ে শহর থেকে প্রায় তিন'শ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এক বোডিং-স্কুলে এমন চুক্তিবদ্ধভাবে দাখিল করে দিলো, যাতে কোনদিন মা-বোনের দর্শণ না পায়! এমনকী ছুটিতেও বাড়ি আসা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল! অথচ নির্বোধ নাবালক গোঙ্গু, ওর মা-বোনের বিচ্ছেদে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না ওর চোখেমুখে। কোনো ভাবান্তরও হলো না। এতটুকু কষ্ট হলো না। মুহূর্ত্যের জন্যও মনকে মলিন ম্রিয়মান করলো না! বরং উৎফুল্ল হয়ে উঠল আনন্দে। মনে মনে বলল, -উফঃ, কি মজা! কেউ শাসন করবে না। কেউ বাঁধা দেবেনা। মনের সাধ মিটিয়ে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারবে। কিন্তু অজ্ঞাত অনভিজ্ঞ গোঙ্গুর ধারণাই ছিলনা যে, বোডিং-স্কুলের নিয়মকানুন, শাসন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা ব্যবস্থা কত কঠোর! কত জটিল! সেখানে ফাঁকি দেওয়া খুবই দুস্কর! একবার ধরা পড়লে আর ক্ষমা নেই! বহিঃস্কার অবধারিত! অথচ কারাবাসের মতোই একরকম ঘড়ি ধরে রুটিনমাফিক বন্দি জীবন! একত্রে দলবদ্ধ হয়ে আড্ডা দেওয়াও নিষিদ্ধ! যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই, আন্তরিকতা নেই! ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসারও কোনো কদর নেই! সবই নিমিত্তমাত্র! সেখানে টিকে থাকাই খুবই মুশকিল ছিল গোঙ্গুর জন্য!

কিন্তু মানুষ পরিবর্তনশীল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র শারীরিক আর মন-মানসিক পরিবর্তনই নয়, জীবনের রূপই বদলে যায় মানুষের! তদ্রুপ জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশে খানিকটা বোধগম্য হতেই একাকী নিঃসঙ্গতায় দেহ-মনে ক্লান্তি আর অবসাদে গোঙ্গুকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। যেদিন ওর অতীতের হাসি-কাঁন্না আর কোলাহলের আনন্দ মুখরিত দিনের অম্লান স্মৃতিগুলিকে কল্পনায় ফিরিয়ে এনে মরমে মরমে উপলব্ধি করেছিল, এ যেন এক অভিশপ্ত জীবন! এক ধরণের নির্বাসিত জীবন! এদের হৃদয় এতো কঠোর! এতটুকু মায়া-দয়া নেই! এর চেয়ে তো নিজের মায়ের হাজারটা বেতের বারিই বরং অনেক ভালো ছিল! আঘাত পেলেও স্নেহমিশ্রিত মায়ের কোমল স্পর্শে পিঠের ওপর মৃদু হস্ত সঞ্চালণেই শরীরের সমস্ত ব্যাথা-বেদনা, মান-অভিমান নিমেষে দূর হয়ে যেতো। আর তার পর মুহূর্ত্যেই বুকে জড়িয়ে ধরে মা আমায় কত আদর করতো! কপালে গালে চুমু দিতো।

ভাবতে ভাবতে অস্ফূট স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে গোঙ্গু,-'মা, মাগো! তুমি কোথায় মা! কেন এতবড় শাস্তি আমায় দিলে মা! আমার জন্য একটুও কি প্রাণ কাঁদে না মা তোমার! এখানে যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে মা! ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে তোমায়! কবে আসবে মা আমায় নিতে!'

গোঙ্গু অনুভব করে, জীবন যেন থেমে গিয়েছে ওর! ক্লান্ত পথিকের মতো শরীরটাও যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কোনো কাজেই মন লাগেনা। সময় মতো নাওয়া-খাওয়া করেনা। কারো সাথে কথাবার্তাও বলতে ইচ্ছা করেনা। ভারাক্রান্ত মনে ক্লাসে চুপচাপ উদাস হয়ে বসে থাকে। হাসতেও যেন ভুলে গিয়েছিল। সূর্য্য ডুবে গেলেই ক্রমশ ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রির মতোই গাঢ় নিস্তব্ধতায় ছেয়ে যায় চারদিক। হষ্টেলের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রিদের কারো সাড়া শব্দও পাওয়া যায়না। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। ওদিকে বিশ্বব্রহ্মান্ড ঘুরতে ঘুরতে আবার সকাল হয়, দূপুর আসে। দূপুর গড়িয়ে সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে রাত ফিরে যায় ভোরে! অথচ একইস্থানে অবস্থানরত গোঙ্গু, মানসিক শূন্যতায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে ওর শরীর ও মন! হাহাকার করে ওঠে বুক। মা-বোনের জন্য ওর মন কাঁদে। প্রাণ কাঁদে। ঘুমই হয়না ওর রাতে! অগত্যা স্মৃতিকাতর গোঙ্গু মনবেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে হাত-পা কুঁকড়ে সারারাত পড়ে থাকে বিছানায়।

কিন্তু মনে মনে বড্ড অভিমান হয় ওর! মনস্থির করে, মা-বোন কেউ নিতে না এলে কোনদিনও আর বাড়ি যাবে না। গোঙ্গু এমন কি অপরাধ করেছিল যে, ওর মুখদর্শণই করতে চায় না কেউ!
গোঙ্গুর মনে পড়ে, শৈশবের খেলার সাথী সুবোলও খুব দুরন্ত ছিল! মা-বাবার অবাধ্য ছিল। ঘরের জিনিসপত্র অনিষ্ট করতো। ভাঙ্গচূড় করতো। ছোটবোন পিঙ্কির সঙ্গে সবসময় মারামারি করতো! ওর চুল টেনে দৌড়ে পালাতো। আর ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে নাকে কাঁদতো পিঙ্কি। কই স্বার্থপরের মতো চোখের আড়াল করে সুবোলের মা-বাবা ওকে তো বোডিং-স্কুলে ফেলে রাখেনি। ঘর থেকেও তো দূর করে দেয়নি! আর হতভাগ্য গোঙ্গু তো কোনদিন চোখেই দ্যাখেনি ওর বাবাকে! মায়ের কাছে শুনেছে, ওর জন্মের বহু আগেই ইহলোক ছেড়ে পরলোকের বাসিন্দা হয়েছেন তিনি। তখন গোঙ্গু কি জানতো, ইহকাল পরকাল মানে কি! শুধু বুঝেছিল, পিতৃস্নেহ-ভালোবাসা যার কপালেই জোটেনি, পিতৃত্বের উষ্ণ পরশ এবং তার মধুর সান্নিধ্যই যে কোনদিনও পায়নি, তার কিইবা মূল্য আছে জীবনের! তাকে কেউ কখনো ভালোবাসে না! কোনদিনও না! কিন্তু মায়ের জন্য গোঙ্গুর কি মন প্রাণ কাঁদে না! একটু দেখতেও কি ওর ইচ্ছে করেনা কাউকে! দিদিদের মতো মাও কি ভুলে গিয়েছে গোঙ্গুকে!

কিন্তু সে খবর গোঙ্গুই বা জানবে কেমন করে! ওর গমনের পর পাড়ায় উৎপাত উপদ্রপ হৈ-হুল্লোড় সব বন্ধ হয়ে গেলেও আকস্মিক পুত্র বিচ্ছেদে রীতিমতো রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েন অন্নপূর্ণাদেবী। গোঙ্গুর নিত্যদিনের ব্যবহার্য জামা-কাপড়, স্কুলেরব্যাগ, ইউনিফর্ম, গোলাকৃতি পাথরের মারবেল, (যে গুলির জন্য প্রতিদিন সুবোলের সঙ্গে ওর মারামারি হতো) ঘরে বাইরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা গোঙ্গুর স্মৃতিগুলি তাকে নিরন্তর কষ্ট দিতো। বিবেকে দংর্শন করতো। ফলে তিনি ক্রমে ক্রমে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অথচ প্রতিদিন হৈ চৈ চিৎকার চেঁচামিচি, কোন্দল অশান্তি থেকে মুক্তি পেতেই মাতৃস্নেহ বঞ্চিত হতভাগ্য গোঙ্গুকে চোখের আড়াল করে দূরে ফেলে রেখেছিল। কিন্তু তার অন্তরাত্মা একদিনও শান্তি পায়নি! উপরন্তু নানা দুঃশ্চিন্তায় অক্টোপাসের মতো তাকে আষ্টে-পাষ্টে ফিরে ধরলো! তবু বুকের মাঝে পাথর চাপা দিয়ে নীরবে সহে গিয়েছিলেন, গোঙ্গুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। ওর অন্ধকার জীবনে আলো ফুটে উঠবে বলে। সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে পৃথিবীর রূপ-রং যেমন বদলে যায়, তেমনি মানুষেরও! গোঙ্গুর জীবনেও একদিন পরিবর্তন আসবেই! তার ইচ্ছা, গোঙ্গু বড় হোক! মানুষের মতো মানুষ হোক! জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ হোক। সুমতি হোক। আর পাঁচটা ছেলের মতো ভালো-মন্দ বুঝতে শিখুক। নিজের পায়ে নিজস্ব মাটিতে দাঁড়াতে শিখুক। মায়ের ব্যথাটা গহীন অনুভূতি দিয়ে উপলদ্ধি করতে শিখুক। কিন্তু বিছানায় শয্যা নিয়ে পুত্রবিরহে কাতর, মুহ্যমান

অন্নপূর্ণাদেবী তার একমাত্র পুত্র গোঙ্গুর চরম সাফলতার কামনায় তার উচ্চাকাঙ্ক্ষিত সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই যে চিরদিনের মতো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়বেন, তা কে জানতো!

একদিন হঠাৎ হৃদক্রিয়া বিকল হয়ে মহাপ্রয়াণ ঘটে অন্নপূর্ণাদেবীর। চলে গেলেন এই মায়ার সংসার ছেড়ে! যেদিন তার পাশে কেউ ছিলনা! সংসার আর ভাইয়ের খরচ চালাতে দুইদিদিই তখন হিমশিম খাচ্ছিল। চাকুরী নিয়ে দুজনেই ব্যস্ত। কিন্তু অস্তগামী সূর্য্যের মতো দিগন্তের প্রান্তে ডুবে যাবার অপেক্ষায় তিনি যে প্রহর গুনছিলেন, তাইবা কে জানতো! স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ! অথচ সেদিন ভোর রাত্রিরেই অমঙ্গলের একটা সংকেত টের পাচ্ছিল গোঙ্গু মনে মনে! অহেতুক বুকের ভিতরটা বারবার কেঁপে উঠছিল ওর। একদন্ডও স্বস্তি পাচ্ছিল না। শুধু এপাশ আর ওপাশ করছিল বিছানায়।

সাধারণতঃ ছুটির দিনে একটু দেরীতেই ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস গোঙ্গুর! কিন্তু ঘুমটা সেদিন কেন যে ভেঙ্গে গেল, জানালা দিয়ে দেখে, তখনও আবছা অন্ধকার চারদিকে। গুমোট মেঘাচ্ছন্ন আকাশ! একটুও বাতাস নেই। পশু-পাখীর কলোরব নেই। চারদিক নীরব, গাঢ় নিস্তব্ধ! যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীটা। এক্ষুণিই প্রলয়ঙ্করী বেগে তুফান ছুটে এসে ছড়িয়ে পড়বে দ্বিগ্বিদিকে।

মুহূর্ত্যেই বিষাদে ছেয়ে গেল গোঙ্গুর শরীর আর মন! তবু ছুটির দিন, রবিবার, কলেজ যাবার তাড়া নেই! তাই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ার কোনো তাগিদবোধই করল না! কিন্তু জানালার কার্ণিশে বসে থাকা পাতিকাকটা কোন এক দুঃসংবাদই যেন বয়ে নিয়ে এসেছে! ওর শ্রুতিকটূ একটানা কাঁ কাঁ শব্দে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল গোঙ্গু। খাঁচার বন্দী পাখীর মতো ছট্‌ফট্ করতে লাগলো, হষ্টেলের পরিবেষ্টিত গম্ভীর সীমাবদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। ইচ্ছে হচ্ছিল, এই মুহূর্ত্যে দৌড়ে মায়ের কাছে চলে যেতে।

গোঙ্গুর নিরবিচ্ছিন্ন মনটা আর সুস্থির হয়ে থাকতে পারলো না। তক্ষুণিই বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বোডিং-এর সকল রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে উষার প্রথম সূর্য্য ওঠার পূর্বেই চুপিচুপি হষ্টেলের বিশাল প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে বাইরে। পিছন ফিরেও আর তাকালো না! সরাসরি গাড়িতে চেপে মরিয়া হয়ে উর্দ্ধঃশ্বাসে ছুটে আসে মায়ের কাছে। কিন্তু কোথায় মা! মায়ের সারা শব্দই তো নেই কোথাও!

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল গোঙ্গুর। থমকে দাঁড়িয়ে দেখল, ওদের বাড়ির প্রাঙ্গনে অগণিত মানুষের ভীড়! তার ভিতর থেকেই ভেসে আসছে, মরা কাঁন্নার শব্দ। সবাই বেদনাহত, বিমূঢ় ম্লান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখে জল। বুঝতে কি আর বাকী থাকে কিছু!

গোঙ্গু দূর থেকেই 'মা' বলে আর্তচিৎকার করতে করতে ছুটে আসে। দুইহাতে বুক চাপড়াতে থাকে। মৃত মায়ের পা-দু'খানি বুকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করে বলে ওঠে, 'মা, মাগো! আমার ওপর অভিমান করে তুমি চলে গেলে মা! চোখ খোলো মা, দ্যাখো, আমি তোমার গোঙ্গু! ফিরে এসেছি! তোমার গোঙ্গু এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে মা! আর কক্ষনো তোমার অবাধ্য হবো না মা, মাগো, তুমি কেন একটিবার আমায় জানালে না মা! শেষবারের মতো তোমার কোলে মাথা রেখে কেন একটিবার কথা বলার সুযোগ আমায় দিলে না মা, মাগো!' বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের প্রাণহীন নিথর দেহের উপর আঁছড়ে পড়ল গোঙ্গু।

এই তো জীবন মানুষের! দু'দিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কাঁন্না, আনন্দ-বেদনার এ জীবন! শুধুই মায়ার খেলা! কিন্তু একজন গর্ভধারিনী মায়ের বুক উজার করা আদর-স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা? সেও কি মায়ার খেলা? না, মোটেই নয়! সেটা হলো মাতৃত্বের একাত্ম বন্ধন! আপন গর্ভে লালিত সন্তান আর মায়ের নারীর চিরন্তন বন্ধন! সে এক অবিচ্ছেদ্য গভীর টান! যা মৃত্যুর পরও ছিন্ন হয়ে যায়না! আর যায়না বলেই সেই কাকঝিলের পাশে দাঁড়ালে দূর থেকে দেখা যায়, গোঙ্গু মায়ের বিশাল মন্দিরের

চূড়া। যার প্রমাণসরূপ নির্মিত নিঁখুত কারুকার্যময় গোঙ্গুর মায়ের স্মৃতিরসৌধ। চূড়ার মধ্যস্থলে শ্বেতপাথরে খোদাই করা বিরাট অক্ষরে লেখা, 'মাতৃ মন্দির অন্নপূর্ণা।' যেখানে আজও প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যে দুইবেলা ফুল-বেলপাতা চড়িয়ে, ধূপ-ধূনো জ্বালিয়ে, কাঁসা-ঘন্টা বাজিয়ে, শুদ্ধচিত্তে কায় মন বাক্যে গোঙ্গু কামনা করে, ওর মৃত মায়ের আত্মার পরম শান্তি!

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com

লেখিকার আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন